بسم الله الرحمن الرحيم

# যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৪ জানুয়ারি, ২০২৫ মোতাবেক ২৪ সুলাহ্, ১৪০৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

তাশাহহুদ, তা'ঊয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর যুগের বিভিন্ন সারিয়্যা বা সেনাভিযানের উল্লেখ করা হচ্ছে। এই ধারাবাহিকতায় আজ প্রথমে **কুরয্ বিন জাবের (রা.)**-র (সেনাভিযানের) উল্লেখ করব। এই সেনাভিযান ৬ষ্ঠ হিজরীর শওয়াল মাসে **উরানিজীনের** দিকে সংঘটিত হয়েছিল। কারো কারো মতে, এই সেনাভিযান ছিল সাঈদ বিন যায়েদ (রা.)-র। কিন্তু অধিকাংশের বক্তব্য হলো, এই সেনাভিযানটি কুরয্ বিন জাবের (রা.)-র ছিল। এছাড়া একটি ভাষ্য এমনও রয়েছে যে, (এটি) জারীর বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)-র ছিল; তবে এই বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যানও করা হয়েছে। জারীর বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) এই সেনাভিযানের চার বছর পর মুসলমান হয়েছিলেন। এই সারিয়্যা বা সেনাভিযানের কারণ হলো, মহানবী (সা.)-এর নিকট কয়েকজন মানুষ আসে। বুখারী (শরীফের) কিতাবুল জিহাদ ও কিতাবুদ্ দিয়াত-এ হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, সেই আটজন **উক্ল এবং উরায়না** গোত্রের ছিল। ইবনে জারীর ও আবু আওয়ানা (রা.)-র মতে, উরায়না গোত্র থেকে চারজন, উক্ল গোত্র থেকে তিনজন এবং অষ্টম ব্যক্তি এ দুই গোত্রভুক্ত ছিল না। তার বংশপরিচয় জানা নেই। অতএব, তারা মহানবী (সা.)-এর নিকট আসে এবং ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করে। আরেকটি রেওয়ায়েতে আছে, তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে; তবে তারা অসুস্থ ছিল। আবু আওয়ানা (রা.) বর্ণনা করেন, তারা (শারীরিকভাবে) খুবই দুর্বল ছিল আর তাদের গায়ের রঙ অত্যধিক হলুদাভ ছিল এবং তাদের পেট বড়ো ছিল। তারা বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমাদেরকে আশ্রয় দিন এবং আমাদের আহার করান। তারা মসজিদে নববীর বারান্দায় অবস্থান করছিল। অতঃপর তারা যখন আরোগ্য লাভ করে তখন মদীনার আবহাওয়া তাদের শরীরের জন্য উপযুক্ত ছিল না। অর্থাৎ ক্ষুধার (যন্ত্রণার) কারণে যে অসুস্থতা ও দুর্বলতা ছিল তা দূরীভূত হয় বটে, কিন্তু সার্বিকভাবে মদীনার আবহাওয়া, অর্থাৎ শহুরে আবহাওয়া তাদের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত ছিল না। ইবনে ইসহাকের মতে, তারা (মদীনার) আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে দুর্বল হয়ে পড়ে। যদিও তারা এক দিক থেকে ক্ষুধার কারণে সৃষ্ট দুর্বলতা কাটিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছিল, কিন্তু অপরদিকে অন্যান্য রোগ-ব্যাধি দেখা দেয়। যাহোক, একটি রেওয়ায়েতে আছে, সেই দিনগুলোতে মদীনায় একটি মহামারি দেখা দেয়; যেটিকে **বিরসাম** বলা হয়। **বিরসাম** একটি রোগ যা মস্তিষ্ককে প্রভাবিত করে আর মাথায় ও বক্ষে ফোসকা পড়ে। তারা বলে, এই রোগ এখানে পৌঁছে গিয়েছে আর মদীনার আবহাওয়াও আমাদের জন্য অনুপযুক্ত। আমরা পশুপালন করি, আমরা কৃষিজীবি নই; আমাদের জন্য দুধের ব্যবস্থা করে দিন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, আমার কাছে আর তো কিছু নেই, কিন্তু তোমরা দুগ্ধবতী উটনীগুলোর কাছে চলে যাও; এবং তাদেরকে চারণভূমিতে পাঠিয়ে দেন। একটি রেওয়ায়েতে আছে,

মহানবী (সা.) তাদেরকে **ফ্যায়ফাউল খাবার**-এর রাখালদের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দেন। **ফ্যায়ফাউল খাবার** মদীনার নিকটবর্তী একটি মরুভূমি ছিল।

যাহোক, এই রেওয়ায়েত থেকে এটিই প্রতীয়মান হয়, তারা মদীনায় বেশি দিন অবস্থান করে নি, বরং তাড়াতাড়ি মদীনার বাইরে চলে যায় আর উটনীর দুধ পান করে তাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়। অপর এক রেওয়ায়েতে এটিও এসেছে যে, মহানবী (সা.) তাদেরকে সদকার উটনীর পালের নিকট যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন যেন তারা সেসব উটনীর দুধ পান করতে পারে। অতএব, তারা উটনীগুলোর কাছে গিয়ে সেগুলোর দুধ পান করে। অতএব, তারা যখন আরোগ্য লাভ করে এবং তাদের দেহ পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে আর তাদের পেট ছোট হয়ে আসে, তখন তারা ইসলাম গ্রহণের পর কাফির হয়ে দুগ্ধবতী উটনীগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যায়। একদিকে ছিল মহানবী (সা.)-এর সহানুভূতি আর অপরদিকে তাদের এই আচরণ, অর্থাৎ সুস্থ হওয়ার পর তারা ধোঁকা দেয়। কথিত আছে, মহানবী (সা.)-এর মুক্ত ক্রীতদাস **ইয়াসার** এবং তার কতিপয় সঙ্গী যখন তাদেরকে ধরে ফেলেন। (অর্থাৎ তারা যখন উটনীগুলো নিয়ে চলে যাচ্ছিল বা উটনীগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল তখন। অর্থাৎ, কাফির হয়ে দুগ্ধবতী উটনীগুলোকে নিজেদের সাথে নিয়ে যাওয়ার সময়।) যাহোক, মুসলমানরা তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করে বা আটক করে তখন তারাও পাল্টা আক্রমণ করে, তারাও (মুসলমানদের সাথে) লড়াই করে। অতএব, এরা **ইয়াসার** (রা.)-র হাত ও পা কেটে এবং তার জিহ্বা ও চোখে কাঁটা বিদ্ধ করে, পরিণামে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। এরা যারা এসেছিল; অর্থাৎ যারা ডাকাতি করে অথবা চুরি করে উটনীগুলো নিয়ে গিয়েছিল, তারা মুসলমানদের যে রাখাল ছিলেন তার সাথে লড়াই করে তাকেও হত্যা করে। এরপর তারা রাখালদের দিকে এগিয়ে যায়, (প্রথমে তো ইয়াসারকে হত্যা করেছিল), এরপর বাকি রাখালদেরও হত্যা করে। এক ব্যক্তি তাঁর (সা.) সকাশে উপস্থিত হয় এবং বলে, তারা আমার সাথীকে হত্যা করেছে। তাদের মধ্যে একজন প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলেন, তারা উটগুলো নিয়ে চলে গেছে।

মুহাম্মদ বিন উমর (রা.)-র রেওয়ায়েত হলো, বনু আমর বিন অওফ (গোত্রের) একজন নারী নিজের গাধায় ওপরে আরোহণ করে এদিকে আসে এবং ইয়াসার (রা.)-র পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তিনি তখন গাছের নীচে পড়ে ছিলেন। সেই (নারী) যখন তার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল ততক্ষণে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। সেই (মহিলা) তার জাতির লোকদের কাছে ফিরে যায় এবং তাদেরকে এই ঘটনা অবগত করে। অতএব তারাও বের হয়, এমনকি ইয়াসার (রা.)-কে মৃত অবস্থায় তুলে কুবায় নিয়ে আসে।

সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েত হলো, মহানবী (সা.)-এর নিকট আনসারের বিশজন যুবক উপস্থিত ছিল। তিনি (সা.) তাদেরকে প্রেরণ করেন। একটি রেওয়ায়েতে আছে, মহানবী (সা.) তাদের পদচিহ্নের অনুসরণে বিশজন অশ্বারোহীকে প্রেরণ করেন। অর্থাৎ যখন তারা (উট) নিয়ে চলে গিয়েছিল এবং তিনি (সা.) সংবাদ পান, তখন তিনি (সা.) তাদের পশ্চাদ্ধাবনে বিশজন ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন, তাদেরকে ধরে আনার জন্য। তাদের মধ্যে কয়েকজনের নামও লেখা হয়েছে। যাদের মধ্যে সালমা বিন আকওয়া, আবু রুহুম, আবু যার গিফারী, বুরাইদা বিন হুসায়েব, রাফে' বিন মাকীস এবং তার ভাই জুনদুব বিলাল বিন হারেস, আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন অওফ মুযানি, জুয়াল বিন সুরাকা সা'লবী, সুআয়েদ বিন সাখার জুহনী (রা.) প্রমুখ। তারা সবাই মুহাজির ছিলেন এবং কুরযান বিন জাবের ফেহরী (রা.)-কে তাদের নেতা মনোনীত করেন। মহানবী (সা.) তাদেরকে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করেন।

তাদের সাথে তিনি একজন খোঁজীও প্রেরণ করেন, যে তাদের বিভিন্ন চিহ্নের সন্ধান করতো। আর তিনি (সা.) সেসব শত্রুর বিরুদ্ধে বদ্‌দোয়া করেন এবং বলেন, **হে আল্লাহ্! তাদের পথ ভুলিয়ে দাও এবং তা তাদের জন্য উটের চামড়ার চেয়েও সরু করে দাও।** অর্থাৎ, তারা যেন সফর করতে না পারে। অতএব, আল্লাহ্ তা'লা তাদের পথ ভুলিয়ে দেন এবং তারা সেদিনই আটক হয়। সকাল হলে তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর সমীপে নিয়ে আসা হয়। (যে বিশজন গিয়েছিলেন তারা তাদেরকে বন্দি করে নিয়ে আসেন।) একটি রেওয়ায়েতে আছে, কুরয বিন জাবের (রা.) ও তার সঙ্গীরা তাদের সন্ধানে বের হন, এমনকি রাত হয়ে যায়। অতএব, তারা **হাররাতে** রাত্রিযাপন করেন। এরপর সকাল হয়, অথচ তারা এটি জানতেন না যে, তারা (শত্রুরা) কোথায় গিয়েছে? হঠাৎ তারা একজন মহিলাকে দেখেন, যে উটের রান বহন করছিল। অতএব, তারা তাকে আটক করেন এবং সেই মহিলাকে জিজ্ঞেস করেন, এটি কী? সেই মহিলা বলে, আমি এক দল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করি; তারা উট জবাই করেছিলো। তারা আমাকে এই রানটি দিয়েছে এবং তারা এই জঙ্গলে রয়েছে। (অর্থাৎ, তাকেও মাংসের কিছু টুকরো দিয়েছিল, পায়ের বা রানের উপরিভাগের অংশ।) সে বলে, তোমরা যখন তাদেরকে দেখবে তখন তাদের (রান্নার) ধোঁয়া দেখতে পাবে। (তারা যেখানে বসে আছে সেখান থেকে ধোঁয়া উঠছে।) অতএব, তারা অর্থাৎ সাহাবীরা অগ্রসর হন এবং এমন সময় তাদের নিকট পৌঁছেন যখন তারা খাওয়া-দাওয়া শেষ করেছিল। সাহাবীরা তাদেরকে আত্মসমর্পণ করতে বললে (তারা) সবাই আটক হয় এবং তাদের মধ্য থেকে একজনও অবশিষ্ট ছিল না। এরপর সাহাবীরা তাদেরকে বেঁধে ফেলেন এবং নিজেদের ঘোড়ার পেছনে বসিয়ে তাদেরকে মদীনায় নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) তখন **রাগাবা** নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। **রাগাবা** ছিল **জুরফের** নিকটবর্তী একটি জায়গা আর জুরফ মদীনা থেকে তিন মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল। যাহোক, তারা (সাহাবীরা) তাদেরকে নিয়ে মহানবী (সা.)-এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি তাদের পেছনে কয়েকজন যুবককে নিয়ে রওয়ানা হই, এমনকি মহানবী (সা.) রাগাবা উপত্যকায় পানির প্রবাহ জমা হওয়ার স্থানে তাদের সাথে মিলিত হন। তখন মহানবী (সা.) লোহার শলাকা নিয়ে আসার নির্দেশ দেন আর তা গরম করা হয়, তারপর মহানবী (সা.) লোহার শলাকাগুলো তাদের চোখে বিদ্ধ করেন, কেননা তারা (মুসলমান) রাখালদের চোখে শলাকা বিদ্ধ করেছিল।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর নিকট নিয়ে আসা হলে তিনি (সা.) তাদের এক পাশের হাত কাটেন এবং বিপরীত দিকের পা কেটে দেন আর তাদের চোখে গরম শলাকাবিদ্ধ করে তাদেরকে সূর্যের উত্তাপে ফেলে রাখেন, এমনটি তাদের (মধ্যে) দুজন মারা যায়।

অন্য আরেকটি রেওয়াতে আছে, তাদের চোখে গরম শলাকা বিদ্ধ করা হয় আর তাদেরকে সূর্যের উত্তাপে ফেলে রাখা হয়। তারা পানি চাইতো, কিন্তু তাদের পানি দেয়া হতো না। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আমি তাদের মধ্য হতে একজনকে দেখি, যে প্রচণ্ড তৃষ্ণার কারণে মুখ দিয়ে জিহ্বা চুষছিল; যাতে সে (কিছুটা) শীতলতা অনুভব করে। তীব্র গরম এবং রোদের উত্তাপের কারণে সে মারা যায়। আর তার রক্তপাত বন্ধের জন্য কোনো পট্টি বাঁধা হয়নি, (তার কোনো চিকিৎসা করা হয়নি।) আবু কিলাবা (রা.) বর্ণনা করেন, তারা এমন মানুষ ছিল, যারা হত্যা করেছে, চুরিও করেছে, এবং ইসলাম গ্রহণ করার পর কাফির হয়ে গিয়েছিল আর আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিল।

ইবনে সীরীন বর্ণনা করেন, **আরনিয়্যীনের** এই ঘটনাটি (কুরআনের) সীমাতিক্রম না করার আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বের ঘটনা। যাহোক, এসব ঘটনা ঘটেছিল। বাহ্যত মনে হয়, মুসলমানরা অনেক অবিচার করেছিল, কিন্তু ইসলামের যে শিক্ষা তা পরবর্তীতে অবতীর্ণ হয় আর তা হলো, আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন,

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ *

অর্থাৎ, **যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়, নিশ্চয় তাদের শাস্তি হলো, তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হোক বা ক্রুশবিদ্ধ করে মারা হোক অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হোক কিংবা তাদেরকে নির্বাসিত করা হোক। এটি হলো ইহকালে তাদের জন্য লাঞ্ছনা এবং পরকালেও রয়েছে তাদের জন্য এক মহা-শাস্তি।** (সূরা আল্ মায়েদা-৩৪)

মহানবী (সা.) এরপর কখনো কারো চোখে শলাকা বিদ্ধ করেন নি, কারও জিহ্বা কাটেন নি আর হাত-পা কাটার চেয়ে গুরুতর কোনো শাস্তি দেন নি। এরপর তিনি (সা.) যে সেনাদল-ই প্রেরণ করেন, তাদেরকে (মরদেহের) অঙ্গচ্ছেদ করতে বারণ করেছেন। এরপর তিনি (সা.) তাদেরকে সদকা প্রদানে উৎসাহিত করতেন এবং অঙ্গচ্ছেদ করতে বাধা দিতেন।

মুহাম্মদ বিন উমর ওয়াকদী এবং ইবনে সা'দ (রা.) বর্ণনা করেন, পনেরটি উটনী ছিল যা তারা চারণভূমি থেকে (চুরি করে) নিয়ে গিয়েছিল। যাহোক, শত্রুরা মুসলমানদের সাথে এমন (নিষ্ঠুর) আচরণ করেছিল যার দরুন তাদের বিরুদ্ধে এই প্রতিশোধ নেয়া হয়েছিল; ঠিক সেভাবেই যেমনটি তারা করেছিল, আর তদ্রুপ শাস্তিই দেয়া হয়। কিন্তু এরপর ইসলামী শিক্ষানুযায়ী আর কখনো শত্রুদের সাথে এমন আচরণ করা হয়নি। যদিও এটি-ই এর উত্তর, কিন্তু ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তিকারীদের কারো কারো আপত্তি, শত্রুদের সাথে কেন এমন পাশবিক আচরণ করা হলো? এর কিছুটা বিস্তারিত উত্তর হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে খুবই চমৎকারভাবে প্রদান করেছেন। তিনি লিখেন,

'মুসলমানদের জন্য সেই দিনগুলো ছিল খুবই ভীতিকর, কেননা কুরাইশ এবং ইহুদীদের উস্কানিতে গোটা দেশ তাদের শত্রুতার আগুনে জলছিল। আর নিজেদের নিত্যনতুন দুরভিসন্ধির আলোকে তারা এই সিদ্ধান্তও গ্রহণ করেছিল যে, মদীনায় রীতিমত আক্রমণ করার পরিবর্তে চোরাগোপ্তা (হামলা করে) ক্ষতি সাধন করা হোক। যেহেতু প্রতারণা এবং বিশ্বাসঘাতকতা আরবের হিংস্র গোত্রগুলোর চারত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল, এজন্য তারা সকল বৈধ ও অবৈধ পন্থায় মুসলমানদের ক্ষতি সাধনে উঠেপড়ে লেগেছিল। কাজেই, (যে ঘটনা বর্ণনা করতে যাচ্ছিলেন; সেই ঘটনাই উল্লেখ করেন)। এটি সেই অপকর্মের-ই একটি ধারা ছিল যা পরিণামে এক ভয়ানকরূপে প্রদর্শিত হয়। তিনি (রা.) আরও লেখেন, এর বিশদ বিবরণ হলো, ৬ষ্ঠ হিজরীর শওয়াল মাসে **উক্‌ল ও উরায়না** গোত্রের কয়েকজন সদস্য, যারা সংখ্যায় ছিল ৮জন, মদীনায় আসে এবং ইসলামের প্রতি ভালোবাসা ও অনুরাগ প্রকাশ করে মুসলমান হয়ে যায়। কিছু দিন অবস্থানের পর মদীনার আবহাওয়াতে তাদের উদর ও প্লীহা প্রভৃতির বিভিন্ন কষ্ট দেখা দেয়, এবং এই অজুহাতে (তারা) মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় আর নিজেদের দুর্ভোগের বা কষ্টের কথা উল্লেখ করে বলে, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমরা মরুবাসী এবং গবাদি পশুদের সাথে বসবাস করে জীবন কাটিয়েছি, আর শহুরে জীবনযাপনে অভ্যস্ত নই– তাই অসুস্থ হয়ে পড়েছি। মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের যদি এখানে মদীনায়

কষ্ট হয় তাহলে মদীনার বাইরে যেখানে আমাদের গবাদি পশুগুলো থাকে– সেখানে চলে যাও। (আতিথেয়তার দায়িত্ব পালন করেন, স্নেহসুলভ ব্যবহার করেন।) উটের দুধ ইত্যাদি পান করতে থাকো। সেখানে স্বাস্থ্যকর জায়গায় থেকে আরোগ্য লাভ করবে। একটি রেওয়ায়েতে আছে, তারা নিজেরাই বলেছিল, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিলে আমরা মদীনার বাইরে যেখানে আপনার গবাদি পশু থাকে, সেখানে চলে যাবো। তিনি (সা.) এর অনুমতি প্রদান করেন। যাহোক, তারা মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মদীনার বাইরে সেই চারণভূমিতে চলে যায়, যেখানে মুসলমানদের উট থাকত।

এই দুর্ভাগারা যখন সেখানে নিজেদের অবস্থান পোক্ত করে এবং অগ্র-পশ্চাৎ দেখে পুরো পরিবেশ-পরিস্থিতি যাচাই করে নেয়, আর মুক্ত বাতাসে থেকে এবং উটনীর দুধ পান করে বেশ হৃষ্টপুষ্ট হয়, তখন একদিন অকস্মাৎ উটের রাখালদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে হত্যা করে। আর এমন নির্দয়ভাবে হত্যা করে যে, প্রথমে (তাদেরকে) পশুর মতো জবাই করে। এরপর যখন (তাদের মাঝে) সামান্য প্রাণ অবশিষ্ট ছিল তখন তাদের জিহ্বায় মরুভূমির তীক্ষ্ম কাঁটা বিদ্ধ করে দেয়, যাতে তারা যদি মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের করে অথবা পিপাসায় কাতর হয় তখন এই কাঁটা তাদের কষ্টের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করবে। অতঃপর, এই পাষণ্ডরা এতেই ক্ষান্ত হয় নি বরং গরম শলাকা নিয়ে এই মৃতপ্রায় মুসলমানদের চোখে বিদ্ধ করে। আর এভাবে এই নিরপরাধ মুসলমানরা উন্মুক্ত প্রান্তরে ছটফট করতে করতে প্রাণ হারায়। তাদের মাঝে মহানবী (সা.)-এর একজন ব্যক্তিগত সেবকও ছিলেন, যার নাম ছিল **ইয়াসার**, যিনি মহানবী (সা.)-এর উট দেখাশোনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন।

এই পাষণ্ডরা এমন নিষ্ঠুরভাবে মুসলমানদের হত্যা করার পর সবগুলো উট জড়ো করে সেগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। একজন রাখাল মহানবী (সা.)-এর কাছে এসে এই পরিস্থিতি অবগত করেন, যিনি ঘটনাক্রমে প্রাণে বেঁচে পালিয়ে এসেছিলেন। তখন তিনি (সা.) তৎক্ষণাৎ বিশজন সাহাবীর একটি দল গঠন করে তাদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করেন। যদিও এই লোকেরা অর্থাৎ, শত্রুরা ইতঃমধ্যে কিছুটা দুরত্ব অতিক্রম করে ফেলেছিল কিন্তু খোদা তা'লা অনুগ্রহ করেন যে, মুসলমানরা ত্বরিত গতিতে পিছু ধাওয়া করে তাদেরকে ধরে ফেলেন এবং রশি দিয়ে বেঁধে (মদীনায়) ফিরিয়ে আনে। তখনও পর্যন্ত মহানবী (সা.)-এর প্রতি এ মর্মে কোনো আদেশ অবতীর্ণ হয় নি যে, কেউ এ ধরনের অপরাধ করলে তার সাথে কী ব্যবহার করা উচিত। তাই মহানবী (সা.) তাঁর অনুসৃত রীতি অনুযায়ী অর্থাৎ, 'যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামে কোনো নতুন আদেশ অবতীর্ণ না হতো ততক্ষণ পর্যন্ত আহলে-কিতাবের বিধান অনুসরণ করা উচিত'– এই নীতি অবলম্বন করতেন। মূসায়ী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী নির্দেশ প্রদান করেন যে, ঐ পাষণ্ডরা মুসলমান রাখালদের সাথে যেমন ব্যবহার করেছে, তাদের সাথেও প্রতিশোধমূলক এবং প্রত্যুত্তরমূলক ব্যবহার করা হোক। [এটি হযরত মূসা (আ.)-এর শিক্ষা ছিল এবং যতদিন পর্যন্ত শরীয়তের বিধিনিষেধ পূর্ণরূপে অবতীর্ণ হয় নি ততদিন পর্যন্ত তদনুযায়ী আমল করা হতো]। যাহোক, এটি এ কারণে করা হয় যাতে এই শাস্তি অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে যায়। কাজেই, সামান্য পরিবর্তনসহ সেভাবেই মদীনার বাইরে উন্মুক্ত প্রান্তরে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। কিন্তু ইসলামের জন্য খোদা তা'লা অন্য এক বিধান নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। যেমন, পরবর্তীতে পাল্টা আক্রমণ এবং প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রেও মুসলা'র (তথা মৃতের অঙ্গচ্ছেদের) শাস্তি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। অর্থাৎ, এ বিষয়টি অবৈধ আখ্যা দেওয়া হয় অর্থাৎ যেকোনো পরিস্থিতিতেই মরদহ

বিকৃত করা অথবা প্রতিশোধমূলকভাবে মৃতদেহ খণ্ডবিখণ্ড করা ইত্যাদি (অবৈধ আখ্যা দেওয়া হয়)।

এ ঘটনা সম্পর্কে তিনি (রা.) লিখেন, এ সম্পর্কে আমার বেশি কিছু লেখার প্রয়োজন নাই। কেননা, এ ঘটনায়, অন্যায়ের সূচনা কাফিরদের পক্ষ থেকেই হয়েছিল। যারা কোনো বৈধ কারণ ছাড়াই কেবল ইসলামের শত্রুতায় নিরপরাধ মুসলমানদের সাথে এধরনের নির্দয় ও বর্বর আচরণ করেছিল। আর তাদেরকে যে শাস্তিই দেয়া হয়েছে তা কেবল প্রতিশোধমূলক ও প্রত্যুত্তরমূলক ছিল। [অর্থাৎ শত্রুদের যে শাস্তি দেওয়া হয়েছে তা কেবল কিসাস (তথা প্রতিশোধমূলক) ছিল। আর এই শাস্তি এমন সময়ে কার্যকর করা হয় যখন ইসলামের বিরুদ্ধে গোটা দেশ শত্রুতা ও বিরোধিতার আগুনে দাউদাউ করে জ্বলছিল।] আর এ সিদ্ধান্তও মূসা (আ.)-এর বিধান অনুযায়ী কার্যকর করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ইসলাম এই বিধানকে বহাল রাখে নি বরং ভবিষ্যতে এই রীতি অনুসরণ করতে বারণ করা হয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ (সিদ্ধান্তের) বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করতে পারে না। এক্ষেত্রে একথাও স্মরণ রাখতে হবে, এরা শুরু থেকেই দুষ্কৃতির অভিপ্রায়ে মদীনায় এসেছিল। সম্ভবত তারা তাদের গোত্র দ্বারা প্রশিক্ষিত ছিল– তারা যেন মুসলমানদের মাঝে অবস্থান করে মুসলমানদের ক্ষতি সাধন করে। মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধেও হয়ত তারা (হত্যার) কোনো চক্রান্ত করে থাকতে পারে। কিন্তু মদীনায় অবস্থান করে তারা যখন কোনো সুযোগ খুঁজে পায়নি তখন তারা ষড়যন্ত্র করে যে, মদীনার বাইরে গিয়ে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক। তাদের এহেন দুরভিসন্ধি এ ঘটনা থেকে প্রতিভাত হয় যে, তারা মুসলমান রাখালদের সাথে যে ব্যবহার করেছে তা কোনো (সাধারণ) চোর কিংবা ডাকাতদের আচরণ ছিল না বরং সুস্পষ্ট প্রতিহিংসামূলক ছিল। শুরুতেই তারা যদি আন্তরিকভাবে মুসলমান হয়ে থাকত আর পরবর্তীতে উট দেখে তাদের সংকল্প পরিবর্তন হয়ে গিয়ে থাকত, তাহলে এমতাবস্থায় তারা উট নিয়ে পলায়ন করতে পারতো। আর যদি কোনো রাখাল তাদের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতো তাহলে তারা সর্বোচ্চ তাকে হত্যা করে পালিয়ে যেত। কিন্তু তারা যেভাবে মুসলমান রাখালদেরকে হত্যা করেছে আর নিজেদেরকে বিপদের মুখে ফেলে হত্যার নৃশংসতাকে দীর্ঘায়িত করেছে, [ঘটনার পর সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে] এবং তাদেরকে কষ্ট দিয়ে হত্যা করেছে, এতে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, তাদের এই কর্ম কোনো অকস্মাৎ লালসার পরিণাম ছিল না বরং সুস্পষ্টভাবে প্রতিহিংসার বর্হিপ্রকাশ ছিল এবং হৃদয়ের বিদ্বেষ ও দীর্ঘদিনের লালন করা ঘৃণার বহির্প্রকাশ ছিল। আর তাদের এরূপ বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডের প্রত্যুত্তরে মহানবী (সা.) যা-ই করেছেন তা কেবল প্রতিশোধমূলক ও পাল্টা আক্রমণ ছিল, যা ইসলামী বিধান অবতীর্ণ হবার পূর্বে মূসায়ী শরীয়তের (বিধান) অনুসারে কার্যকর করা হয়। কিন্তু এর অনতিপরেই ইসলামী বিধান অবতীর্ণ হয়। আর তাতে এ ধরনের প্রতিশোধমূলক শাস্তি প্রদানকেও অবৈধ ঘোষণা করা হয়। যেমন বুখারীর ভাষ্য হলো,

ان النبی صلی اللہ علیہ و سلم بعد ذلک کان یحث علی الصدقۃ و ینھی عن المثلۃ

অর্থাৎ এই ঘটনার পর মহানবী (সা.) অনুগ্রহ ও উত্তম আচরণ করার নসীহত করতেন আর সর্বাবস্থায় শত্রুদের দেহের মুসলা তথা বিকৃতি সাধন করতে নিষেধ করতেন।

কতক পশ্চিমা গবেষক, যাদের মধ্যে মিওর সাহেবও অন্তর্ভুক্ত, এই ঘটনার চিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে স্বভাবসুলভ এই আপত্তি করে যে, যে-পদ্ধতিতে এই হত্যাকারী ডাকাতদের হত্যা করা হয়েছে তা ছিল নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতা; কিন্তু যদি সার্বিক পরিস্থিতি দৃষ্টিপটে রেখে

লক্ষ্য করা হয় তাহলে এ ঘটনায় ইসলামের আঁচল সম্পূর্ণ পবিত্র দৃষ্টিগোচর হয়। কেননা এই সিদ্ধান্ত মূলত ইসলামের (সিদ্ধান্ত) ছিল না, বরং হযরত মূসা (আ.)-এর (সিদ্ধান্ত) ছিল, যাঁর শরীয়তকে হযরত ঈসা (আ.) বাতিল করেন নি, বরং বহাল রেখেছিলেন। তবে হ্যাঁ, আমাদের প্রতি আপত্তিকারীদের দৃষ্টিতে যদি হযরত মসীহ্ (আ.)-এর এই বাক্য থেকে থাকে যে, **'এক গালে চড় খেয়ে অপর গালও পেতে দাও, কেউ যদি তোমার জামা নিতে চায় তবে তাকে তোমার জুব্বাও দিয়ে দাও, আর যদি কেউ তোমাকে জোর পূর্বক এক ক্রোশ নিয়ে যেতে চায় তবে দুই ক্রোশ চলে যাও'**– সেক্ষেত্রে নিশ্চয় আমাদের আপত্তিকারীদের এই আপত্তি করার অধিকার আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই শিক্ষা কি কোনো বিবেকবান ব্যক্তির দৃষ্টিতে বাস্তবায়নযোগ্য? আর আজ পর্যন্ত এই সাড়ে উনিশশত বছরে, বরং এখন তো দুই হাজার বছরের অধিক হয়ে গেছে, কোনো খ্রিষ্টান নারী বা পুরুষ অথবা কোনো খ্রিষ্টান ফির্কা বা সরকার এই শিক্ষার ওপর আমল করেছে কি? মিম্বরে চড়ে উপদেশ প্রদানের জন্য নিঃসন্দেহে এটি একটি উত্তম শিক্ষা, কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে এই শিক্ষার কোনো মূল্য নেই আর না কোনো বিবেকবান ব্যক্তি এই শিক্ষার ওপর আমল করতে প্রস্তুত হবে। সেক্ষেত্রে এরূপ আবেগপূর্ণ খেলনা সামনে রেখে মুসলমানদেরকে আপত্তির লক্ষ্যস্থল বানানো স্বয়ং তাদেরই অজ্ঞতার পরিচায়ক। তবে হ্যাঁ, হযরত মূসা (আ.)-এর শিক্ষাকে সামনে রেখে দেখো যিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর বিপরীতে একজন প্রকৃত শরীয়তধারী ছিলেন এবং আইনের বাস্তবতা সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন। অথবা খ্রিষ্টানদের মৌখিক কথার পরিবর্তে তাদের ব্যবহারিক জীবনের আলোকে পরিস্থিতি বিচার করো, তাহলেই প্রকৃত বিষয় স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোনো ধর্মই ইসলামের মোকাবিলা করতে পারে না। কেননা ইসলাম যা বলে তা-ই করে এবং এর কথা ও কাজ ভিন্ন ভিন্ন নয়; আর ইসলামের কথা ও কাজ উভয়টি এরূপ উন্নত মানে অধিষ্ঠিত যে, কোনো বুদ্ধিমান উদারমনা ব্যক্তি এর ওপর আপত্তি করতে পারে না, বরং মন থেকে এর প্রশংসা বের হয়। মূসায়ী শরীয়তের ন্যায় ইসলাম একথা বলে না যে, **'সর্বাবস্থায় প্রতিশোধ গ্রহণ করো এবং প্রতিশোধের অবস্থা বিবেচনা না করেই কুঠার চালাতে থাকো।** আর ইসলাম ধর্ম মসীহ্‌র শিক্ষা অনুযায়ী এই নির্দেশনাও দেয় না যে, **'কোনো পরিস্থিতিতেই শাস্তি প্রদান কোরো না, বরং অপরাধী যদি কোনো অপরাধ করে তবে তাকে শাস্তি না দিয়ে তার অত্যাচারের বাসনাকে নিজের পক্ষ থেকে সহায়তার মাধ্যমে আরো শক্তিশালী করে দাও'** বরং ইসলাম উগ্রতা ও শিথীলতার চরমপন্থার পরিবর্তে সেই মধ্যমপন্থা অবলম্বনের শিক্ষা প্রদান করে যা পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার মূলভিত্তি। আর তা হলো এই যে,

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ (সূরা শূরা: ৪১)

অর্থাৎ প্রত্যেক মন্দের প্রতিফল তার অনুরূপ ও তার তীব্রতা অনুযায়ী হওয়া উচিত। কিন্তু অবস্থা যদি এমন হয়ে থাকে যে, ক্ষমা করলে বা নমনীয়তা প্রদর্শন করলে সংশোধনের সম্ভাবনা আছে, সেক্ষেত্রে ক্ষমা করা বা নমনীয়তা প্রদর্শন করাই উত্তম। আর এরূপ ব্যক্তি খোদা তা'লার নিকট উত্তম প্রতিদান লাভের যোগ্য হবে।

এটি সেই শিক্ষা যা ইসলাম এ বিষয়ে প্রদান করেছে এবং কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা অস্বীকার করতে পারবে না যে, এটি একটি মহান শিক্ষা যেখানে মানবীয় প্রয়োজনীয়তার সকল দিককে দৃষ্টিপটে রাখা হয়েছে। আর শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রেও ইসলাম এই সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, তা যেন যথোচিত হয়, সীমালঙ্ঘন যেন না করা হয় এবং

মুসলা (তথা মৃতের অঙ্গচ্ছেদ) প্রভৃতির ন্যায় বর্বরতাকে এক বাক্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর বিপরীতে খ্রিষ্টানরা হযরত ঈসা (আ.)-এর এই বাহ্যিক শিক্ষা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শত্রুদের সাথে আচরণের যেই ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আসছে এবং যুদ্ধসমূহে যেসব কর্মকাণ্ড করেছে এবং করছে, সেটি বিশ্ব ইতিহাসের এক উন্মুক্ত অধ্যায় যার পুনরাবৃত্তির এখানে প্রয়োজন নেই। তারা কী না করে!

এখন আরেকটি যুদ্ধের উল্লেখ করবো যেটিকে যি কারদ-এর যুদ্ধ বলা হয়। এর সম্পর্কে ইতিহাসবিদ ও হাদীস বিশারদদের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে যে, এটি কবে সংঘটিত হয়েছে। হাদীস বিশারদরা এটিকে হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে এবং খায়বারের যুদ্ধের পূর্বে ষষ্ঠ হিজরীর জিলক্বদ মাস এবং সপ্তম হিজরীর মহররম মাসের মধ্যবর্তী যুদ্ধ আখ্যা দিয়ে থাকেন। অপরদিকে ইতিহাসবিদরা এটিকে লিহয়ানের যুদ্ধের পওে, অর্থাৎ ষষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল উলা মাসের যুদ্ধ আখ্যা দেয়। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের মতে যি কারদ-এর যুদ্ধ খায়বারের যুদ্ধের তিন দিন পূর্বে সংঘটিত হয় এবং তারা এর উল্লেখ হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে এবং খায়বারের যুদ্ধের পূর্বে করেছেন। আল্লামা ইবনে হাজার লিখেছেন যে, ইমাম আহমদ ও ইমাম মুসলিম আইয়্যাস বিন সালামার যেই রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন সেটি এই কথাকে সমর্থন করে যে, এই যুদ্ধ খায়বারের যুদ্ধের তিন দিন পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। এই রেওয়ায়েতে হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা.) প্রথমে হুদায়বিয়ার সন্ধি এবং এরপর যি কারদ-এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। পরিশেষে বলেছেন, এরপর আমরা মদীনাতে ফেরত আসি এবং তিনদিন মাত্র মদীনাতে অবস্থান করেই খায়বারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাই। এর বিপরীতে ইতিহাসবিদদের মধ্য থেকে আল্লামা ইবনে ইসহাক এবং ইবনে সা'দ বলেন, যি কারদ-এর যুদ্ধ ছয় হিজরীতে হুদায়বিয়ার সন্ধির পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল।

এই বিষয়টির বিশ্লেষণ হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে করেছেন, পূর্ণাঙ্গীনরূপে যদিও করেন নি, কিন্তু নিজের পুস্তকের অবশিষ্টাংশের জন্য যেই বিষয়সূচি তিনি লিখেছেন, তাতে তিনি যি কারদ-এর যুদ্ধকে খায়বারের যুদ্ধের পূর্বে সপ্তম হিজরীর মহররম মাসের যুদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন। যি কারদ-এর যুদ্ধকে গাবা-র যুদ্ধও বলা হয়ে থাকে। কেননা মহানবী (সা.)-এর উটনীগুলো এখানে চরানো হতো। গাবা মদীনা থেকে সিরিয়ার দিকে চার মাইল দূরত্বে উহুদ পাহাড়ের পিছনে একটি ময়দান ছিল। আর এটিকে যি কারদ-এর যুদ্ধ এজন্য বলা হয় যে, উআয়না বিন হিসন, যে মহানবী (সা.) এর উটনীগুলো হামলা করে নিয়ে গিয়েছিলো, মহানবী (সা.) যি কারদ পর্যন্ত তার পিছু ধাওয়া করেছিলেন। যি কারদ মদীনা থেকে প্রায় বারো মাইল দূরত্বে অবস্থিত একটি ঝরনা।

এর বিস্তারিত বিবরণ হলো- রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর বিশটি দুগ্ধবতী উটনী ছিল। আরো কিছু উটও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। যেগুলো মদীনা থেকে খায়বারের পথে বায়যা চারণভূমি এবং এর অপর দিকের পাহাড় পর্যন্ত চরে বেড়াতো। সেখানে অনাবৃষ্টি দেখা দেয়, তখন সেগুলোকে গাবার দিকে নিয়ে আসা হয়। একজন রাখাল প্রতিদিন মাগরিবের সময় সেগুলোর দুধ দোহন করে মহানবী (সা.) এর কাছে নিয়ে আসতো। উআয়না বিন হিসন ফাযারী বনু গাতফানের চল্লিশজন অশ্বারোহীর সাথে সেগুলোর ওপর আক্রমণ করে এবং উটগুলো নিয়ে যায়। একটি রেওয়ায়েত অনুসারে তাদের নেতা উআয়নার পুত্র আব্দুর রহমান ছিল এবং উআয়না তাদের সাহায্যের জন্য পেছনে একটি স্থানে অপেক্ষমান ছিলো। আক্রমণের সময় শত্রুরা হযরত আবু যার (রা.) এর পুত্র যারকে হত্যা করে, যে এই উটগুলোর রাখাল ছিল।

আর হযরত আবু যারের (রা.) স্ত্রী লায়লাকে বন্দি করে নিয়ে যায়। অথচ হযরত আবু যার (রা.)-এর পুত্রবধু, যে সেখানেই উপস্থিত ছিল, শত্রুদের হাত থেকে বেঁচে যায়।

উআয়না বিন হিসন কে ছিলো– তার পরিচয়ে লেখা আছে যে, উআয়না আহযাবের যুদ্ধের সময় বনু ফুযারা গোত্রের নেতা ছিলো। আহযাবের যুদ্ধের সময় যখন শত্রুদের তিনটি সেনাবাহিনী বনু কুরায়যার সাথে যোগ দিয়ে মদীনার ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ করার সংকল্প করেছিলো তখন তাদের একটি সেনাদলের নেতা ছিলো উআয়না। উআয়না বিন হিসন মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করে। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে যে, উআয়না মক্কা বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এবং এতে অংশ নিয়েছিলো। আর হুনায়েনের যুদ্ধ এবং তায়েফের যুদ্ধেও যোগদান করেছিলো। মহানবী (সা.) তাকে বনু তামীম গোত্রকে দমন করার জন্য পঞ্চাশ জন আরোহী সহ প্রেরণ করেছিলেন। তাদের মাঝে কোনো আনসার কিংবা মুহাজের সাহাবী ছিল না। আর এই অভিযানের কারণ যা ছিল তা হলো- বনু তামিম গোত্র মহানবী (সা.) এর কর্মচারীকে সদকা নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছিল। এরপর আবু বকরের যুগে বিদ্রোহী মুরতাদদের সাথে সে-ও ধর্মত্যাগের নৈরাজ্যের শিকার হয়ে পড়ে এবং তুলায়হা যখন নবুয়তের দাবি করে তখন তার সাথে যোগ দেয়। অর্থাৎ সে প্রথমে মুসলমান হয়, এরপর সে মুরতাদ হয়ে যায় এবং তার (অর্থাৎ তুলায়হার) হাতে বয়আত করে। এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দিকের (রা.) কাছে বন্দি হয়ে আসলে তিনি (রা.) তার প্রতি অনুগ্রহ করে তাকে ক্ষমা করে দেন। এরপর সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে। অর্থাৎ তার ঈমানের অবস্থা এরূপ দোদুল্যমান ছিল।

রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, মহানবী (সা.) হযরত আবু যার গিফারীকে (রা.) গাবা যেতে বাধা দিয়েছিলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) এর সাবধান করা সত্ত্বেও হযরত আবু যার গিফারী (রা.) গাবা যান। এর বিস্তারিত বর্ণনায় লেখা আছে যে, উআয়নার আক্রমণের পূর্বে হযরত আবু যার মহানবী (সা.) এর কাছে উঁনীগুলোর চারণভূমির দিকে যাবার অনুমতি চান। তিনি (সা.) বলেন, আমি তোমার বিষয়ে এই ভেবে শঙ্কিত যে- শত্রু তোমার ওপর এদিক থেকে আক্রমণ না করে বসে, কেননা আমরা উআয়না ও তার সঙ্গীদের দিক থেকে নিরাপদ নই। আর এই জায়গাও তাদের নিকটবর্তী। হযরত আবু যার (রা.) জেদ করেন। মহানবী (সা.) বলেন, আমার ভয় হচ্ছে- তোমার ছেলেকে হত্যা এবং তোমার স্ত্রীকে বন্দি করা হবে আর তুমি একটি লাঠিতে ভর করে ফিরে আসবে। হযরত আবু যার (রা.) বলেন, আমি নিজের কাজে বিস্মিত, মহানবী (সা.) বার বার বলছিলেন যে, আমি তোমার বিষয়ে শঙ্কিত আর আমি এরপরও জেদ করেছি। অতঃপর আল্লাহর কসম! তেমনই ঘটে যেমনটি মহানবী (সা.) বলেছিলেন। আমি ঘরে ছিলাম আর মহানবী (সা.) এর উটনীগুলো খামারে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। তাদের পরিতৃপ্ত করা হয়েছিল, অর্থাৎ তাদের খাবার ও পানি দেয়া হয়েছিল। সেগুলোর দুধ দোহন করা হয়েছিল। এরপর আমরা ঘুমিয়ে পড়লে রাতের বেলা উআয়না চল্লিশজন অশ্বারোহী নিয়ে আমাদের ওপর আক্রমণ করে। তারা থেমে যুদ্ধের হাঁক দেয়। তখন আমার ছেলে বাহিরে বের হয়, যাকে তারা হত্যা করে ফেলে।

এই প্রেক্ষিতে হযরত সালামা বিন আকওয়ার (রা.) শত্রুদের পিছুধাওয়া করারও উল্লেখ পাওয়া যায়। বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সালামা বিন আকওয়া (রা.) বর্ণনা করেন, আমি ফজরের প্রথম আযান দেবার পূর্বেই বের হই। মহানবী (সা.)-এর দুগ্ধবতী উটনীগুলো যি-করদ নামক স্থানে চরানো হতো। হযরত সালামার সাথে মহানবী (সা.) এর ক্রীতদাস রাবাহ্ও ছিল। হযরত সালামা বলেন, আব্দুর রহমান বিন অওফ এর এক ছেলের

সাথে আমার দেখা হয় আর সে আমাকে বলে, মহানবী (সা.) এর উটনীগুলো ছিনতাই হয়েছে। আমি বললাম, সেগুলো কে ছিনতাই করেছে? সে বলল, গাতফান গোত্রের লোকেরা। তিনি অর্থাৎ হযরত সালামা বলেন, আমি উচ্চৈস্বরে তিন বার হে সাবাহা বলে ডাকি। এই শব্দ বিপদের সময় বলা হতো। তাই আমি মদীনায় যারা ছিল তাদেরকে উচ্চৈস্বরে জানিয়ে দেই যেন তারা সেখানে চলে আসে। তার গলার স্বর যথেষ্ট উঁচু ছিল আর মহানবী (সা.)-কে খবর দেবার জন্য রাবাহ্‌কে প্রেরণ করি। এরপর বলেন, আমি সামনের দিকে ছুটতে শুরু করি এবং সেই আক্রমণকারী ডাকাতদের কাছে পৌঁছে যাই। তখন তারা তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছিল। আমি আমার তির দ্বারা তাদের ওপর আক্রমণ করতে থাকি আর আমি অভিজ্ঞ তিরন্দাজ ছিলাম। আমি বলছিলাম, আমি ইবনে আকওয়া আর আজ কেবল কাপুরুষদের ধ্বংসের দিন। অর্থাৎ তিনি একাই মোকাবিলার জন্য বেরিয়ে পড়েন। আর আমি উচ্চৈস্বরে এটি পাঠ করছিলাম। আমি যখন গাছপালার মাঝে থাকতাম তখন তাদের ওপর তির নিক্ষেপ করতাম। আর যখন সংকীর্ণ গিরিপথ আসতো তখন পাহাড়ে চড়ে তাদের ওপর পাথর ফেলতাম। এমনকি তাদের কাছ থেকে সকল উট মুক্ত করে নেই। সহীহ মুসলিমে এই শব্দাবলি রয়েছে। আমি এভাবেই তাদের পিছু ধাওয়া করতে থাকি, এমনকি মহানবী (সা.) এর উটগুলোর মধ্য থেকে এমন কোনো উট বাকি ছিল না যা আমি আল্লাহর কৃপায় মুক্ত করি নি। আর তাদের কাছ থেকে ত্রিশটি চাদরও ছিনিয়ে নেই যা তারা বোঝা কমানোর জন্য ছুটতে ছুটতে ফেলে দিয়েছিল। যে জিনিসই তারা ফেলে দিত আমি সেগুলোর ওপর চিহ্নস্বরূপ পাথর রেখে দিতাম, যেন মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা চিনতে পারেন। আর আমি তাদের পিছুধাওয়া করতে থাকি এবং তাদের প্রতি তির নিক্ষেপ করতে থাকি। অর্থাৎ তিনি একাই মোকাবিলা করতে থাকেন। ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থে এ হাদীসের দ্বিতীয় প্রারম্ভ সম্পর্কে এটিও লেখা আছে যে, সকল উষ্ট্রী ফেরত আনা সম্ভব হয় নি। কিছু উষ্ট্রী শত্রুরা নিজেদের সাথে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছিল। যাহোক, অপরদিকে মহানবী (সা.)-এর নিকট যখন এ ঘটনার সংবাদ পৌঁছে তখন মদীনায় ঘোষণা করা হয় যে, বিপদের সময় এসেছে। অতএব ঘোষণা দেওয়া হয়, **ইয়া খাইলুল্লাহিল কাবীর**। অর্থাৎ, হে আল্লাহ্‌র অশ্বারোহী দল! আরোহণ করো। তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহীরা তাঁর (সা.) নিকট একত্রিত হতে থাকেন। সর্বপ্রথম হযরত মিকদাদ (রা.) তাঁর (সা.) সমীপে উপস্থিত হন। অতঃপর হযরত আব্বাদ বিন বিশর, সা'দ বিন যায়েদ, উসায়েদ বিন হুযায়ের, উকাশা মু'রিয বিন নাযলা, আবু কাতাদা এবং আবু আইয়াশ-ও পৌঁছে যান। মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন যায়েদ (রা.)-কে আমীর নিযুক্ত করেন এবং বলেন, শত্রুর মোকাবিলার জন্য বের হও। আর আমিও দলবল-সহ তোমাদের সাথে এসে মিলিত হবো। অর্থাৎ তিনি (সা.) বলেন, তোমরা সামনে যেতে থাকো আর আমি পিছন পিছন আসছি। মহানবী (সা.) পাঁচশ সাহাবীকে সাথে নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেন। আর এটিও বলা হয়ে থাকে যে, সাতশ (সাহাবী) নিয়ে যাত্রা আরম্ভ করেন। তিনি (সা.) মদীনায় হযরত ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)-কে নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন আর হযরত সা'দ বিন উবাদা (রা.)-কে তিনশ সাহাবী সমেত মদীনার সুরক্ষার জন্য পিছনে রাখেন। মহানবী (সা.) হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ (রা.)-এর বর্শার মাথায় পতাকা বেঁধে দেন।

এই অভিযানে একটি ঘটনার উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, ইবনে ইসহাক বলেন, মহানবী (সা.) বলেন, হে আবু আইয়াশ! তুমি কি তোমার ঘোড়া এমন কাউকে দিতে পারছো না, যে কি-না তোমার চেয়ে উত্তম আরোহী? যেন সে শত্রুর সাথে মিলিত হতে পারে। হযরত

আবু আইয়াশ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমিই সবচেয়ে উত্তম অশ্বারোহী। তিনি বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-কে এই কথা বলে বসি এবং এরপর আমি ঘোড়া হাঁকাই, কিন্তু পঞ্চাশ গজ যেতে না যেতেই সেটি আমাকে মাটিতে ফেলে দেয়। আমি অবাক হই যে, মহানবী (সা.) আমাকে নিজের চেয়ে ভালো আরোহীকে ঘোড়াটি দিয়ে দিতে বলছিলেন আর আমি বলছিলাম, আমিই সবচেয়ে ভালো আরোহী। অতঃপর মহানবী (সা.) হযরত আবু আইয়াশ-এর ঘোড়া হযরত মুআয বিন মায়েস-কে দিয়ে দেন। হযরত সালামা, যিনি শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন, বলেন, দিনের আলো ফুটলে উআয়না তাদের সাহায্যের জন্য আসে। এ থেকে বুঝা যায় যে, উআয়না নিজে সেখানে উপস্থিত ছিল। সে একটি সংকীর্ণ ঘাঁটিতে অবস্থান করছিল। তিনি বলেন, আমি পাহাড়ের ওপর আরোহণ করি। উআয়না বলে, এ ব্যক্তি কে? উআয়নার সঙ্গীরা তাকে বলে, সকাল থেকে এখন পর্যন্ত আমরা এই বিপদেই আছি যে, সে আমাদের পিছুধাওয়া করছে, আমাদের ওপর তির বর্ষণ করছে এবং তাদের পশুগুলোকে ছাড়িয়ে নিচ্ছে। সে আমাদের সব জিনিস ছিনিয়ে নিয়েছে। উআয়না বলে, তার যদি এ বিশ্বাস না থাকত যে, তার পিছন পিছন লোকেরা আসছে, তবে সে তোমাদের অনেক আগেই ছেড়ে পালাতো। সে বেশ চতুর ছিল। সে বলল, নিশ্চিতরূপে তার পিছনে অন্য কোনো দল আসছে। তোমাদের মধ্য থেকে কিছু মানুষ তার দিকে যাও। অর্থাৎ সে তার সঙ্গীদেও একথা বলে। অতএব তাদের মধ্য থেকে চার ব্যক্তি আমার দিকে আসে এবং পাহাড়ে আরোহণ করে। আমি তাদেরকে বললাম, তোমরা কি আমাকে চেনো? তারা বলল, তুমি কে? আমি বললাম, আমি ইবনে আকওয়া। সেই সত্তার কসম, যিনি মহানবী (সা.)-কে মর্যাদা দান করেছেন! তোমাদের মাঝে কেউ আমাকে ধরতে পারবে না আর আমি যদি তার পশ্চাদ্ধাবন করি, তবে সে আমার হাত থেকে বাঁচতে পারবে না। তাদের মধ্য থেকে একজন বলল, আমার ধারণাও তা-ই। অতঃপর তারা ভয়ে ফেরত চলে যায়। এটি বুখারীর রেওয়ায়েত।

হযরত সালামা বর্ণনা করেন যে, আমি সেখানেই ছিলাম। এমতাবস্থায় আমি রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর সেই অশ্বারোহীদের দেখতে পেলাম যাদেরকে মহানবী (সা.) তাঁর পূর্বে প্রেরণ করেছিলেন। তারা গাছের আড়াল থেকে প্রকাশিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, তাদের মাঝে সর্বপ্রথমে ছিলেন মু'রেয বিন নাযলা আখরাম আসাদী আর তার পেছনে ছিলেন আবু কাতাদা আনসারী আর তার পর মিকদাদ বিন আসওয়াদ ছিলেন, যিনি পরবর্তীতে আসেন। আমি আখরামের ঘোড়ার লাগাম ধরে বললাম, হে আখরাম! তুমি তাদেও ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করো, যেন তারা তোমাকে হত্যা করতে না পারে। অর্থাৎ সামনে অগ্রসর হয়ো না, ততক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করো যতক্ষণ না রসূলুল্লাহ্‌ (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা এসে পৌঁছেন। তিনি বলেন, হে সালামা! তুমি যদি আল্লাহ্‌ ও পরকালে ঈমান রাখো আর তুমি জানো যে, জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, তাহলে তুমি আমার এবং শাহাদাতের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ো না। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তিনি একথা বলেন। তিনি (অর্থাৎ সালামা) বলেন, আমি তাকে ছেড়ে দেই। অতঃপর হযরত আখরাম এবং আব্দুর রহমান বিন উআয়না পরস্পর মুখোমুখি হয় আর তিনি আব্দুর রহমানসহ তার ঘোড়াকে আহত করেন। আর আব্দুর রহমান তাকে বর্শা মেরে শহীদ করে দেয় এবং তার ঘোড়ার ওপর আরোহণ করে পিছনে চলে যায়।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আখরামকে অওবার শহীদ করেছিল। অওবার ও তার পুত্র একই উটে আরোহিত ছিল। হযরত উকাশা একটি বর্শা নিক্ষেপ করেন আর তাদের উভয়কে এক আঘাতেই হত্যা করেন।

আরেক রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত আখরামকে মাসআদা শহীদ করেছিল। শাহাদতের ঘটনা সম্পর্কে একটি স্বপ্নেরও উল্লেখ রয়েছে। হযরত আখরাম শত্রুদের সাথে লড়াইয়ের এক দিন পূর্বে স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, আমার জন্য আকাশ উন্মুক্ত করা হয়েছে আর আমি আকাশে প্রবেশ করেছি, এমনকি আমি সপ্তম আকাশে আর এরপর সিদরাতুল মুনতাহাতে পৌঁছে গিয়েছি। আমাকে বলা হলো, এটিই তোমার ঠিকানা। আমি এ স্বপ্ন হযরত আবু বকরের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বলেন, তোমার জন্য শাহাদত মোবারক হোক। আর এর একদিন পরই তাকে শহীদ করা হয়। হযরত মু'রেয-এর পিছনে হযরত আবু কাতাদাও পৌঁছে গিয়েছিলেন। মহানবী (সা.)-এর অশ্বারোহী আবু কাতাদা-র লড়াই আব্দুর রহমান বিন উআয়নার সাথে হয়। তারা একে অপরের প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করতে থাকে। উআয়নার পুত্র আবু কাতাদা-র ঘোড়ার পায়ের রগ কেটে দেয় আর হযরত আবু কাতাদা তার ভবলীলা সাঙ্গ করেন এবং স্বয়ং তার ঘোড়ায় উঠে বসেন।

হযরত আবু কাতাদা-র মাসআদা ফাজারীর সাথে লড়াইয়ের ব্যাপারেও উল্লেখ রয়েছে। এক বর্ণনানুযায়ী হযরত আবু কাতাদা যখন এই ঘটনা অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণের সংবাদ জানতে পারেন তখন মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের সাথে মদিনা থেকে সফর করে যুবাবে অবস্থানরত ছিলেন, যা সানিয়্যাতুল বাদা থেকে নীচের দিকে উহুদ পাহাড়ের পথে একটি ছোট কালো পাহাড়। তিনি রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে আসলে তিনি (সা.) বলেন, হে আবু কাতাদা! সামনে অগ্রসর হও। আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করুন। হযরত আবু কাতাদা বলেন, আমি রওয়ানা হই আর আমার সাথে আরেক ব্যক্তি ছিলেন। আমরা উভয়ে দ্রুত শত্রুদের কাছে পৌঁছে যাই। তার সঙ্গী তাকে বলেন, হে আবু কাতাদা! তোমার কি মনে হয়? তাদের মোকাবিলার সামর্থ্য আমাদের নেই। তিনি বলেন, তুমি কি বলছো যে, আমি মহানবী (সা.)-এর আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করব? অর্থাৎ আমরা দুইজন আক্রমণ করার পরিবর্তে পুরো সেনাবাহিনী পেছন থেকে এসে পৌঁছালে তবেই আমরা আক্রমণ করব? আবু কাতাদা বলেন, আমি বললাম, আমি তো চাই যে, তুমি একদিক থেকে আক্রমণ করবে আর আমি আরেক দিক থেকে। এরপর তারা উভয়ে আক্রমণ করেন এবং শত্রুদের বিপদে ফেলে দেন। শত্রুরা তাকে উদ্দেশ্য করে তির নিক্ষেপ করলে একটি তির তার কপালে এসে লাগে। হযরত আবু কাতাদা বলেন, আমি যখন সেই তির বের করি তখন আমার মনে হলো যেন আমি লোহার টুকরা বের করে নিয়েছি। আমি সামনে অগ্রসর হই। তখন এক দ্রুতগামী অশ্বারোহী আমার সামনে আসে, যে শিরস্ত্রাণ পরিহিত ছিল। সে আমাকে চিনতে পেরেছিল, কিন্তু আমি তাকে চিনতে পারি নি। সে বলে, হে আবু কাতাদা! আল্লাহ্ তোমার ও আমার সাক্ষাৎ করিয়েছেন। সে তার চেহারা থেকে শিরস্ত্রাণ নামালে দেখা যায় সে ছিল মাসআদা ফাজারী। সে বলল, তুমি কোনটি পছন্দ করো, তরবারি নাকি বর্ষা চালনা। অর্থাৎ তুমি কীভাবে লড়তে চাও, তরবারি দিয়ে, নাকি বর্শা দিয়ে, নাকি কুস্তি করবে। আমি বললাম, এটি তোমার পছন্দ, তুমি যা চাও করতে পারো। সে বলল, তাহলে আমরা কুস্তি করি। সে যুগে যুদ্ধেরও অদ্ভুত রীতি ছিল! সে নিজের বাহন থেকে নীচে নেমে আসে, আমিও নীচে নেমে আসি। আমি আমার ঘোড়া একটি গাছের সাথে বাঁধি এবং নিজের অস্ত্র সেখানেই রাখি, আর সে-ও তা-ই করে। অতঃপর আমরা লড়াই আরম্ভ করি, আর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তার ওপর বিজয় দান করেন। আমি তার ওপর চড়াও হই। আমি সংকল্প করি যে, আমি উঠে নিজ তলোয়ার নিয়ে নেব আর সে-ও তার তলোয়ার নিয়ে নেবে। আমরা দুটি দলের মাঝখানে ছিলাম, এজন্য আমাদের উভয়ের ওপরই আক্রমণ হতে পারতো। আমার মাথায় কোনো একটি

জিনিস এসে পড়ে। আমরা লড়াই করতে করতে মাসআদার অস্ত্রের কাছে পৌঁছে যাই। আমি হাত বাড়িয়ে তার তরবারি উঠিয়ে নেই। যখন সে দেখল, তার তরবারি আমার হাতে এসে গেছে তখন সে বলল, হে আবু কাতাদা! কিছুটা হলেও আমার সম্মান রেখো। আমি বললাম, না। এখন তুমি তোমার ঠিকানা জাহান্নাম দেখে নাও। অতঃপর তাকে হত্যা করি আর তাকে নিজ চাদরে জড়িয়ে দেই। এরপর তার কাপড় আমি নিজে পরে নেই এবং তার অস্ত্র নিয়ে নেই আর তার ঘোড়ায় আরোহণ করি, কেননা আমরা যখন লড়াই করছিলাম তখন আমার ঘোড়া শত্রুদের দিকে পালিয়ে গিয়েছিল আর তারা সেটির পায়ের রগ কেটে দিয়েছিল। আমি দ্রুততার সাথে সামনে অগ্রসর হই আর মাসআদার ভাতিজাকে ধরে ফেলি। তার সাথে আরো সতেরো জন আরোহী ছিল। আমি তাদেরকে ইশারা করলে তারা থেমে যায়। এরপর আমি যখন তাদের কাছে পৌঁছি তখন আমি তাদের ওপর আক্রমণ করি। আর মাসআদার ভাতিজার প্রতি বর্শা নিক্ষেপ করি এবং তার ঘাড় ভেঙে দেই। তার সঙ্গীরা পলায়ন করে। অতঃপর আমি উটগুলোকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে নেই যা হযরত সালামা বিন আকওয়ার আক্রমণের সময় বিরোধীরা রেখে পলায়ন করেছিল।

এই যুদ্ধের ঘটনার বর্ণনা এখনো বাকি আছে, যা ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণিত হবে।

**(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)**